মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব

গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)

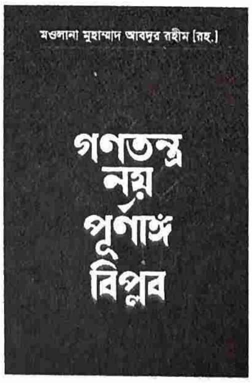

প্রকাশনায়

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

সম্পাদকের কথা

বর্তমান দুনিয়ার একটি বহুল আলোচিত মতবাদ গণতন্ত্র। দুনিয়ার এক বিপুল সংখ্যক মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ডভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা; এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষ অর্জন করতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাই? পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মানুষ কি সুখ ও শান্তির দরিয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত? এ প্রশ্নটি সম্ভবত গণতন্ত্রপ্রেমীরা আদৌ খতিয়ে দেখেন না। তাই গণতন্ত্রের নামে দুনিয়ায় যত শোরগোল উঠছে, মানুষের জীবনে দুঃখ ও দৈন্য ততই বাড়ছে। এমনকি সত্য কথা এই যে, গণতন্ত্রের হোতারাই মানুষকে দুঃখ ও দৈন্যের মুখে ঠেলে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তারের এক সর্বনাশা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমেয় ধূর্ত ও শঠ প্রকৃতির মানুষ খুব সুকৌশলে বৃহত্তর জনসমাজের উপর প্রভু হয়ে বসে নানা মুখরোচক বুলির আড়ালে সাধারণ মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করে এবং তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। আর হতভাগ্য মানুষ

একেই স্বাধীনতা ও স্বাধিকার ভেবে গণতন্ত্রের জন্য প্রাণপাত করে এবং ধূর্ত ও শঠ লোকদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। অথচ কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তির মুখ তারা কোনোদিনই দেখে না; তা চিরকাল শুধু সোনার হরিণরূপে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

এ ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের মহান স্থপতি এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত এ ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিরই বিশদ আলোচনা করেছেন আলোচ্য পুস্তিকায়। তিনি গণতন্ত্রের উৎস, ইতিহাস ও প্রয়োগ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমের এ ভ্রান্ত মতবাদটি দ্বারা মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো কল্যাণই সাধিত হতে পারে না। সেটা হতে পারে কেবল ইসলামী আদর্শভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ গণবিপ্লব দ্বারা। অতএব সে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের লক্ষ্যেই সংগঠিত হওয়া উচিত এদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত গণমানুষের।

পুস্তিকাটি ১৯৮৫ সালের প্রথম ভাগে রচিত ও প্রকাশিত হলেও দেশের জনমনে বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইতোমধ্যেই এর পাঁচটি সংস্করণ শেষ হয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম (রহ.) রিচার্স ফাউন্ডেশন

শুরুর কথা

এমন একটি দেশের কথা কল্পনা করা যায়, যেখানকার শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি লোক নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে দাবি করে। যদিও তারা ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে পালন করছে না বা পালন করতে পারছে না। এই পালন না করার কারণ হতে পারে– তারা প্রায় দু'শ' বছর পর্যন্ত ইংরেজদের গোলাম হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিল। আর ইংরেজরা এ দেশ দখল করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এখানকার মুসলমানদের পূর্ণমাত্রায় 'অমুসলিম' না হলেও 'প্রায় অমুসলিম' বানাবার জন্য ক্রমাগত ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করেছে।

মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তাদের নিজস্ব পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থাকে এখানকার জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে চালু করেছে এবং সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে দেশের শিক্ষার্থীরা সে সব প্রতিষ্ঠানে ভিড় জমিয়েছে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। তার আরও বিশেষ কারণ থাকতে পারে। ইংরেজ শাসকরা নানা কৌশলে মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অতঃপর জীবিকার্জনের সুযোগ লাভ কেবল তখনই সম্ভব বলে মনে করা হলো,

যখন ইংরেজ শাসকদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরই প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাধীন পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে এবং কোনো না কোনো পর্যায়ের সনদ লাভ করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকার্জনও মুসলমানদের জন্য প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল। তা সম্ভব করে রাখা হয়েছিল শুধু তাদের জন্য, যারা ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এককথায়, ইংরেজ শাসকরা এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজায় জীবিকার চাবি ঝুলিয়ে রেখেছিল। যার ইচ্ছা সেখান থেকে ডিগ্রী লাভ করার পর সে চাবি হস্তগত করতে পারে; জীবিকার বদ্ধ দুয়ার খুলে সুখী-সচ্ছল জীবন-যাপনের সুযোগ পেতে পারে।

ইংরেজরা এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণির লোক তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিল, যারা বর্ণ-বংশে এদেশীয় হলেও চিন্তা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যমান ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই হয়েছিল পুরোপুরি ইংরেজ। ইংরেজদের মতোই তারা মনিবসুলভ আচরণ গ্রহণ করেছিল, সাধারণ মানুষকে তারা ঘৃণা করত, তাদেরকে ইংরেজদের মতোই গোলাম বানিয়ে রাখতে শুরু করেছিল।

ইংরেজ শাসকরা পূর্বের সব আইন বাতিল করে গোলাম উপযোগী আইন তৈরি করে তা এদেশে চালু করে দিল। সে আইন-শিক্ষার উচ্চতর ব্যবস্থা এদেশে এবং তাদের নিজেদের দেশে চালু করল। আইন শিক্ষার্থীদের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিল যে, আইন বলতে কেবল ইংরেজদের প্রবর্তিত আইনই বোঝায়। কেবল এ আইনই একালে দেশ শাসনের জন্য একমাত্র উপযুক্ত আইন। এ আইন ছাড়া অন্য সব আইন এমনকি মুসলমানদের নিজেদের আইনও সেকেলে; একালে অচল। এ আইন যারা শিখবে তারাই আইনের ব্যবসা করে একদিকে বিপুল অর্থ রোজগার করতে পারবে, অন্যদিকে জনগণের নেতাও হতে পারবে। কেননা তারাই শাসকদের ভাষা জানে, শাসকদের মন-মেজাজ বোঝে এবং তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। ইংরেজদের দয়ার দান রাজনীতি করার যোগ্যতা কেবল এ আইনের 'জীবী' হলেই লাভ করা যেতে পারে।

ইংরেজরা এদেশে এমন এক অর্থব্যবস্থা চালু করল, যার ভিত্তি স্থাপিত ছিল সূদের উপর। অথচ মুসলমানদের ঈমান– সুদ হচ্ছে কঠিন হারাম

এবং সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ফলে মুসলমানরা দেশে প্রচলিত অর্থনীতির সুযোগ-সুবিধা লাভ করা থেকে হয় বঞ্চিত থাকল, না হয় সুদের মতো হারাম ব্যবস্থায় রোজগার করতে বাধ্য হলো। আর সূদী কারবারে যে জীবিকা অর্জিত হলো, তদ্দরুন একদিকে যেমন হারাম খেয়ে ও পরিবারবর্গকে হারাম খাইয়ে তারা হালাল রিজিক খাওয়ার প্রয়োজন বোধটুকুও নিঃশেষে হারিয়ে ফেলল, অপরদিকে গরীব ও নিঃস্ব লোকদের শোষণ করে নিজেদের বিলাসী জীবন যাপনে তাদের একবিন্দু সংকোচ বা লজ্জাবোধও অবশিষ্ট থাকল না। দরিদ্র জনতার প্রতি থাকল না কোনো দরদ বা সহানুভূতি। তারা নিজেরা যেমন হারাম উপায়-উপকরণের মধ্যে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হলো, তেমনি নিজেদের বংশধরদেরও সেই হারাম জীবিকায় অভ্যস্ত বানিয়ে দিয়ে গেল। ফলে গোটা বংশই সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হতে থাকল।

ইংরেজদের সাংস্কৃতিক জীবনে মদ্যপান এবং নারী-পুরুষের মিলিত অনুষ্ঠান, নৃত্য সঙ্গীত এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা এ সব অনুষ্ঠানে এদেশের ইংরেজি শিক্ষিত ও ইংরেজভক্ত মুসলমানদের শরীক করে মদ্যপানে অভ্যস্ত করে তুলল; ভিন নারী-পুরুষকে অবাধ মেলামেশা এবং যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করে দিল। ফলে তাদের নিকট ইসলামের হালাল-হারাম মূল্যহীন, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত হলো; মুহররম-গায়র মুহররমের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোধও থাকল না, যার পরিণতিতে তারা ইসলাম-বিরোধী একটি শ্রেণিতে পরিণত হলো।

শিক্ষাব্যবস্থায় যুবক-যুবতীদের সহশিক্ষার প্রবর্তন করে ইংরেজ শাসকরা মুসলমান বংশধরদের মন-মগজে পর্দাব্যবস্থাকে উন্নতি ও প্রগতির পরিপন্থী বা তার পথে প্রচণ্ড বাধা হওয়ার ধারণা বদ্ধমূল করে দিল। তারা একই শ্রেণিকক্ষে পাশাপাশি বা সামনা-সামনি বসে পাঠ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি-পরস্পর প্রেম-প্রণয় ও যৌন মিলনের অবাধ সুযোগ পেয়ে চরম সীমায় পৌঁছে যেতেও দ্বিধাবোধ করল না। ফলে এই শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ইসলামের নৈতিক বিধান দুঃসহ ও অনুসরণীয় এবং প্রগতি পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াল।

এভাবে ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের মধ্য থেকে যে লোকদেরকে নিজেদের চিন্তা-চরিত্রের প্রতিভূ বানাতে সক্ষম হয়েছিল, তাদেরকে

মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় বানিয়ে দেবার জন্য নানা বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করল।

এ দেশবাসীর পরাধীনতার সময় যতই অগ্রসর হতে থাকল, ততই এদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হতে লাগল। বালাকোট ট্র্যাজেডীর পরও সারা উপমহাদেশ জুড়ে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের শিক্ষা ও ইংরেজ বিরোধী জিহাদের জের চলছিল। বিশেষ করে এদেশের আলেম সমাজ ইংরেজ শাসনের অধীন ইসলামের প্রভাব দ্রুত বিলীন হতে দেখে এবং ইসলামের মৌল স্বাধীন বিপ্লবী ভাবধারার চাপে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে শুরু করলেন। ইংরেজ বিরোধী তথা স্বাধীনতার এ আন্দোলনে উত্তরকালে ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরাও অগ্রসর হয়ে এল এবং পরবর্তীতে আলেম সমাজের তুলনায় তারাই অধিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তারাই নেতা হয়ে বসল গোটা মুসলিম সমাজের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইংরেজরা এদেশীয় লোকদের মাঝে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন প্রবল হতে দেখে নিজেরাই আঁচ করতে পারল যে, এদেশকে আর বেশিদিন পদানত করে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এতদঞ্চল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য তাদের উপর আন্তর্জাতিক চাপও প্রবল হয়ে দাঁড়াল। ফলে তারা এদেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং এদেশীয় লোকদের হাতে গোটা শাসন কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আর সে জন্য ইংরেজদেরই রচিত ১৯৩৫ সনের স্বায়ত্তশাসন আইনের অধীনে চালু করা প্রক্রিয়াকেই পন্থা হিসাবে অবলম্বন করা হলো।

১৯৩৫ সনে ইংরেজরা এদেশে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন আইনের অধীন ইউরোপে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশেষ পরিমাণ 'কর' দাতাদের ভোটার বানিয়ে তাদের ভোটে নির্বাচিত লোকদের দ্বারা প্রাদেশিক পরিষদ গঠন করে। এর ফলে এদেশে রাজজনৈতিক দল গড়ে ওঠে এবং তার পুরোভাগে বা নেতৃত্বে ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা সাধারণভাবে এবং ইংরেজ-প্রবর্তিত আইনজীবীরা বিশেষভাবে অগ্রসর হয়ে আসে। আর ইংরেজরাও অতি সুকৌশলে এ শ্রেণির লোকদেরকেই

রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে তারাই হয় মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতা।

স্বায়ত্তশাসন আইনের অধীনে ১৯৩৬ সনে প্রথম প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এ ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের এদেশীয় সাগরিদরাই নির্বাচিত হয়। ফলে মুসলিম জনগণের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে, আলেম সমাজ মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা মাত্র, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা নেতৃত্ব দেয়ার উপযুক্ত নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কেবল ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরাই। কেননা তারাই শাসক ইংরেজদের ভাষা ও আইন-কানুন জানে এবং তারাই ইংরেজ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত।

ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর

১৯৪৬ সনে প্রাদেশিক পরিষদভিত্তিক আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনের ফলেই দেশ স্বাধীন হয় এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতে দেশ শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে '৪৭ সনে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যায়।

ইংরেজ-পরবর্তীকালে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, দেশ বাহ্যত 'স্বাধীন' হলেও দেশবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

কেননা একটি স্বাধীন দেশের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রধানত দু'টি। একটি তার নিজস্ব জাতীয় আদর্শ এবং অপরটি তার নিজস্ব জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী, অনুসারী ও বাস্তবায়নকারী নেতৃত্ব-সম্বলিত একটি প্রশাসন।

কিন্তু এ উভয় দিক দিয়ে দেশটি নামে স্বাধীন হলেও কার্যত ইংরেজ আমলের মতোই পরাধীন থেকে গেল।

ইংরেজদের চলে যাওয়ার পরও এ দেশটিকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে রাখল ইংরেজ-চালিত শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন এবং প্রশাসন পদ্ধতি। আর সেই সাথে চেপে বসল ইংরেজদেরই মানস সন্তান ইংরেজি শিক্ষিত, ইংরেজদেরই মন-মানস ও চরিত্রের ধারক-বাহক এবং ইংরেজদেরই অন্ধ গোলাম শ্রেণির লোকেরা। তারা ইংরেজদেরই তৈরি

করা আইন ব্যবস্থার দ্বারা ইংরেজদেরই মন-মানস ও চরিত্র নিয়ে শাসন করতে লাগল এ দেশের কোটি কোটি মুসলমানকে। ফলে ইংরেজ আমলে মুসলিম জনগণ এবং তাদের জাতীয় আদর্শ দ্বীন ইসলাম যেরূপ উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল, ইংরেজদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার, অন্য কথায় স্বাধীনতার পরও ঠিক তেমনিভাবে উপেক্ষিতই হয়ে থাকল। মুসলিম জনতা দ্বীন-ইসলামকে জাতীয় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং নেতৃত্ব থেকে ইংরেজদের মানসপুত্রদের হটিয়ে ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে থাকল।

দেশটির স্বাধীনতার পর

ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর প্রচলিত অর্থে এবার এ দেশটি স্বাধীন হলো। কিন্তু সে স্বাধীনতা জনজীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে দেখা দিল না; বরং তখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ইংরেজদের আইন প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুন যে সব জীবন সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে সবের সমাধানের জন্য দেশবাসীকে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো এবং দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে ভেঙে ফেলা হলো। তখন দেশ আরও একবার স্বাধীন হলো। কিন্তু নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে 'এক সাগর রক্ত' দেয়ার পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হলো, সে স্বাধীনতাও সাধারণভাবে দেশবাসীর ভাগ্যে এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনগণের জীবনে গোলামী জীবনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাল। এক কথায়, যথাপূর্ব তথা পরং-ই হয়ে থাকল।

দ্বিতীয় বারে অর্জিত স্বাধীনতার পরও নিতান্ত গোলামী জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার! কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, এবারেও যেমন ইংরেজ প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-কোনো কিছু থেকেই নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না, তেমনি ইংরেজদের মানসপুত্রদের নেতৃত্ব ও দেশ শাসনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুন স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে যে, দেশবাসী এখনও সেই ইংরেজদেরই গোলামি করছে। স্বাধীনতা তাদের ভাগ্যে এখনও জোটেনি।

একথা সত্য যে, সেই ‘সাত সমুদ্র তেরো নদী’র ওপার থেকে আসা সাদা চামড়ার লোকেরা এখন আর সশরীরে উপস্থিত থেকে এদেশ শাসন করছে না। এখন দেশ শাসন করছে যারা, তারা গাত্রবর্ণ ও জন্মসূত্রে এদেশীয় হলেও অন্য কোনো দিক দিয়েই তাদেরকে ‘এদেশীয়’ মনে হয় না- মনে হয় না এসব লোক এদেশের মুসলিম জনসমাজ থেকে বের হয়ে এসেছে। কেননা চিন্তা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি কোনো একটি দিক দিয়েও এদেশের সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই। অথচ এরা যে এদেশের মুসলিম পরিবারেরই সন্তান, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বস্তুত মুসলিম পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সেই মুসলিম সমাজের সঙ্গে মন-মানস, চিন্তা-বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে কোনোরূপ মিল না থাকা ইংরেজদের দীর্ঘকালীন গোলামীর একটা মারাত্মক অভিশাপ। এ দেশের মুসলমানদের বর্তমান সার্বিক দুর্গতি এ অভিশাপেরই স্বাভাবিক পরিণাম। সাধারণভাবে মুসলমানদের পক্ষে পূর্ণ দ্বীন-ইসলাম পালন করতে না পারার মূলেও এ কারণই নিহিত।

এদেশের শাসক-প্রশাসকরা দেশের বর্তমান আইন-কানুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রশাসন পদ্ধতিতে একবিন্দু পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত নয়। কেননা তারা বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেই দেশের প্রশাসক হয়ে বসবার সুযোগ পেয়েছে, যার দরুন তারা ভোগ করতে পারছে বিচিত্র ধরনের সুযোগ-সুবিধা। কাজেই বর্তমান শিক্ষা ও প্রশাসন পদ্ধতি পরিবর্তিত হলে তারা যে তাতে নিজেদের অনিবার্য মৃত্যু ও ধ্বংস দেখতে পাবে, তাতে আর সন্দেহ কী? আর কোনো ব্যক্তি যেমন নিজের হাতে নিজের মৃত্যু ঘটতে দিতে চায় না, তেমনি ইংরেজদের বদৌলতে দেশের উপর চেপে বসা বর্তমান শাসক-প্রশাসকরাও ইংরেজ আমলের স্থিতাবস্থায় কোনো রদবদলে রাজি হতে পারে না- কস্মিনকালেও রাজি হবে না, তা জোর দিয়েই বলা যায়।

অথচ এদেশের মুসলিম জনতা শুধু মানচিত্র বদলই নয়, ইংরেজ আমলের যাবতীয় অভিশাপ থেকেই মুক্তি চায়। তারা ইংরেজ প্রবর্তিত

শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রশাসন-পদ্ধতি ও আইন-কানুনের গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে আজাদী লাভ করতে চায়। এ দ্বন্দ্বই এদেশের জনগণ ও শাসক-প্রশাসকদের মধ্যে বিরাজমান। সন্দেহ নেই। এ এক কঠিনতম দ্বন্দ্ব। এর নিরসন না হওয়া পর্যন্ত এদেশের কিছুমাত্র অগ্রগতি সম্ভব নয়, সম্ভব নয় স্বাধীনতার একবিন্দু সুফল লাভ করা।

প্রকৃত স্বাধীনতা কীভাবে সম্ভব?

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, এদেশে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন ও প্রশাসন পদ্ধতি ইংরেজরাই চালু করেছিল। ইংরেজরা তা চালু করতে সক্ষম হয়েছিল শুধু এ জন্য যে, তারাই ছিল এদেশের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী, হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাদের ইচ্ছা ছিল, তারা নিজেরা কখনও এদেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেও অন্তত পরোক্ষভাবে যেন তাদের শাসনই এদেশে বহাল থাকে।

আজকের বাস্তব অবস্থা তাদের সে ইচ্ছারই প্রতিফলন, সন্দেহ নেই। তাই বলতে দ্বিধা নেই, দেশটি 'স্বাধীন' হলেও স্বাধীন নয়- নিতান্তই গোলাম দেশ, পরাধীন জীবন। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এমন একটি প্রক্রিয়া এদেশবাসীকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যার ফলে গোলামির উভয় প্রতীক– শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন ও শাসন পদ্ধতি এবং ইংরেজদের মানসপুত্রদের নিকৃষ্ট অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে।

কিন্তু সে প্রক্রিয়া কী?

ইংরেজ-প্রবর্তিত নিয়মে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অনেকে স্বাধীনতার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া বলে মনে করেন এবং তদ্রূপ দাবিও করেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের যে পদ্ধতি যেভাবে তা বাস্তবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাতে গোলামির উপরিউক্ত প্রতীকদ্বয়ের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ কোনোদিন সম্ভব নয়।

বর্তমানে দেশে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, আগেই বলেছি যে, তা ইংরেজদেরই প্রবর্তিত এবং ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত। ইউরোপে মধ্যযুগে দেশ শাসনের সমগ্র কর্তৃত্ব ছিল গির্জার এবং গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের হাতে। তারাই ছিল নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা ও ধর্মীয় নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকারী। চতুর্দশ শতকের পর ইউরোপে রেনেসাঁর সূচনা হয়। কয়েক শতাব্দীব্যাপী রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর শাসন কর্তৃত্ব গির্জা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়। এরপর বিভিন্ন দেশে নিরংকুশ অত্যাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠে এবং রাজতন্ত্র উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনের ফলে রাজতন্ত্র উচ্ছন্নে যায় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে গণতন্ত্র।

পাশ্চাত্যের এ গণতন্ত্রের সারকথা হলো– জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের উপর নির্বাচিত লোকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সার্বভৌমত্বের যে সংজ্ঞা দিয়েছে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট পাত্র তারা খুঁজে পায়নি। তারা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেনি, সংজ্ঞানুযায়ী সার্বভৌম কে? তারা মানুষের বাস্তব জীবনে মহান আল্লাহকে স্বীকার করতে প্রস্তুত না থাকার ফলে সার্বভৌমত্বকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক জগতের উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব চলে না বলে সেখানে আল্লাহর প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব (Natural Sovereignty) স্বীকার করে নিতে তারা কোনো আপত্তি করেনি। তবে মানুষের বাস্তব জীবনের উপর থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব উচ্ছেদ করে সেখানে তারা মানুষের সার্বভৌমত্বকে স্থাপন করেছে সর্বাত্মকভাবে। এ সার্বভৌমত্বকে আবার তারা দু পর্যায়ে বিভক্ত করে নিয়েছে। প্রথমত প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক নাগরিক সার্বভৌম; আর এ সার্বভৌমত্ব কেবল ভোট দানের মাধ্যমেই কার্যকর হতে পারে। দ্বিতীয়ত ভোটদাতাদের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা তথা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সার্বভৌম; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের নেতাই 'পপুলার' সভরেনটি থেকে আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) মালিক হয়ে থাকে।

এ তত্ত্বের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে বিগত শতকে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ইংরেজরা সে ব্যবস্থাকেই এদেশে চালু ও ক্রমবিকাশ

দান করে গেছে। ফলে এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভের রাজনীতি এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলে এসেছে। জনগণের নিকটও এ পদ্ধতি এতদিনে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতির কথা জনগণ জানে না, খুব একটা বোঝেও না। ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলসমূহ এ পথেই ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং কখনও কখনও ক্ষমতাসীন হয়েছেও। ফলে এ পথটিকেই ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র পথরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

নির্বাচনী গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ

শুধু তা-ই নয়। এ ব্যবস্থায় নিয়মিত নির্বাচন হওয়াকেই প্রধানত গণতন্ত্র থাকা মনে করা হয়। আর নিয়মিত নির্বাচন না হলে বা নির্বাচিত ব্যক্তি ক্ষমতাসীন না থাকলে কিংবা সামরিক শাসন কায়েম হলে গণতন্ত্র নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্যের এ গণতন্ত্র ও নির্বাচন পদ্ধতি সর্বতোভাবে একটি সেকিউলার[১] বা ধর্মদ্রোহী ব্যবস্থা। এতে মানুষের উপর প্রশাসনিক ও আইন রচনার ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়; তা একান্তভাবে মানুষের করায়ত্ত। এতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণত কুফরী ব্যবস্থা। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানদার কোনো ব্যক্তি এ ব্যবস্থাকে মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারে না। এক ব্যক্তির নিরংকুশ কর্তৃত্ব বা একটি দল অথবা বিশেষ গোষ্ঠীর নিরংকুশ কর্তৃত্বের মধ্যে মৌলিকভাবে কোনোই পার্থক্য নেই। দলীয় কর্তৃত্ব মূলত দলের নেতার কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত করে। মুজিব, জিয়া, সাত্তার ও এরশাদের ক্ষমতায় কোনোই পার্থক্য নেই। এ ধরনের লোকেরা সাংবিধানিকভাবে মানুষের উপর খোদা হয়ে বসে।[২] কিন্তু তারা প্রকৃত খোদা নয় বলে এদের অধিকাংশই ফুৎকারে উড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়নি।

এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর কথা বাদ দিলেও নির্বাচনী গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রের প্রচলিত নির্বাচন দেশে সত্যিই কি কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে?

প্রশ্নটি সম্পর্কে বাস্তবতার নিরিখে একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-বিবেচনা করা আবশ্যক।

নীতিগতভাবে বলা যায়, মানুষ মূলত সার্বভৌম নয়। সার্বভৌম হতে চাইলেও কখনই সে তা কার্যত হতে পারে না। কেননা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞানুযায়ী সার্বভৌমকে অসীম-নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, সর্বাত্মক-সর্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী ও অবিভাজ্য হতে হবে। কিন্তু দুনিয়ার কোনো মানুষ কখনই এসব গুণের কোনো একটিরও অধিকারী হতে পারে না। তাহলে যারাই সর্বোচ্চ শাসন-ক্ষমতায় আসীন হয়- তা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি হোক বা পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে কোনো জাতীয় সংসদ হোক (দু'টিই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত)-তারা কেউই প্রকৃত 'সার্বভৌম' নয়। আর প্রকৃত সার্বভৌম না হয়েও দেশ শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিরংকুশভাবে ব্যবহার করার কোনো অধিকারই তারা পেতে পারে না। অথচ সেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রেই এ ক্ষমতা দেয়া হয় প্রেসিডেন্টকে কিংবা জাতীয় সংসদকে।

তাই আমি বলব, সেকিউলার গণতন্ত্র– যে গণতন্ত্র বর্তমানে দুনিয়ার দেশে দেশে চালু রয়েছে– একটা ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক তথা মিথ্যা শাসন ব্যবস্থা। এ মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির শাসন ব্যবস্থা দ্বারা জনগণের কোনো কল্যাণই সাধিত হতে পারে না। তাই তা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা একটি নিরেট মিথ্যা তথা 'কুফর'কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ চেষ্টাকে কোনোক্রমেই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা যেতে পারে না। কুরআনের ভাষায় তা হচ্ছে 'জিহাদ ফী সাবীলিত তাগুত'- তাগুতী শাসন কায়েমের সংগ্রাম।

এ পর্যন্ত তাত্ত্বিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলো। কিন্তু বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখলে বিষয়টি অধিকতর বীভৎস হয়ে দেখা দেবে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন কীভাবে হয়?

তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে এক-একটি রাজনৈতিক দল, দলের সদস্য বা কর্মীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে টিকেট (মনোনয়ন) দিয়ে প্রার্থীরূপে দাঁড় করায়। অতঃপর সে প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালানো হয়। জয়লাভের জন্য প্রার্থী নিজেও ভোটদাতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট ভিক্ষা চায়।

রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত 'সেকিউলার বা ধর্মদ্রোহী' রাজনীতি করে। সেকিউলার ব্যক্তিরাই তার নেতা, উপনেতা ও কর্মী হয়। তাই প্রার্থী নির্বাচনে আদর্শবাদ ও নৈতিকতার প্রশ্নটি সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে সাধারণত নৈতিকতার মানে উত্তীর্ণ কোনো ব্যক্তিই প্রার্থী হয় না। প্রার্থী হয় তারা যাদের অঢেল টাকা আছে; যাদের দাপট ও কর্তৃত্ব করার-ভোট আদায় করার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি; যারা জনগণের নিকট 'আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দেয়া'র মিথ্যা ওয়াদা করতে সক্ষম।

এসব নির্বাচনে ব্যক্তির পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। অসংখ্য কর্মীকে ক্যানভাসার নিয়োগ করা হয়। তারা যে-কোনোভাবে ও যে কোনো কথা বলে ভোট আদায়ের চেষ্টা চালায়। ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে আনতে হয় এবং ফেরত পৌঁছিয়ে দিতে হয়। পান-বিড়ি-সিগারেট ও চা-বিস্কুট থেকে শুরু করে বিরিয়ানী পর্যন্ত খাওয়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। আর প্রায় সব নির্বাচনেই জাল ভোটের স্রোতে প্রকৃত ভোটের সুফল রসাতলে যায়।

এভাবে নির্বাচনে এক-একজন প্রার্থীকে যে কত রাশি রাশি টাকা ব্যয় করতে হয়, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বস্তুত যে প্রার্থীর জন্য এই অপরিমেয় বেহিসাবী টাকা ব্যয় করা হবে, সে-ই নির্বাচিত হওয়ার আশা করতে পারে। যে পারে না বা যার জন্য সেরূপ বেহিসাবী টাকা ব্যয় করা হয় না, সাধারণত তার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। এরূপ নির্বাচনে ইসলামী দলের প্রার্থীকেও অনুরূপ কার্যকলাপ চালাতে হয়; না চালিয়ে কোনো উপায় থাকে না। উপরন্তু তাদেরকে মুখে এ

ঘোষণাও দিতে হয় যে, আমাদের ভোট দিলে আমরা ইসলামী হুকুমাত কায়েম করব। অথচ কার্যত তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয় না; বরং অনৈসলামী সংবিধানের ভিত্তিতে প্রচলিত নিয়মে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারাও নিজেদেরকে সেকিউলার বানিয়ে নেয় এবং পরিণামে 'ইসলামী' হওয়ার সব বিশেষত্বই হারাতে বাধ্য হয়।

এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার পর এক-একজন সংসদ সদস্যের প্রধান লক্ষ্যই থাকে, কী করে ব্যয়িত অর্থ ফেরত পাওয়া যেতে পারে। তদুপরি অনুরূপ পরিমাণ অর্থ পরবর্তী নির্বাচনেও ব্যয় করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাকে তৎপর হতে হয়।

এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত বা বিজয়ী ব্যক্তি কখনো সর্বমোট ভোট দাতাদের অধিকাংশের প্রতিনিধি হতে পারে না। অনেকে মোট প্রদত্ত ভোটেরও এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে হয় কম সংখ্যক ভোটারের প্রতিনিধি, অধিক সংখ্যকের নয়।৩

এই 'কম সংখ্যক' ভোটারের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই সংসদে গিয়ে জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ভোটদানের অধিকারী হয়ে থাকে। ফলে তারা কোনো একটি সমস্যারও সমাধান করতে সক্ষম হয় না, বরং তাদের একদেশদর্শী চিন্তা, বিবেচনা ও অপরিণত-অনবহিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যে সব আইন পাস করা হয়, তা জাতীয় জীবনে অসংখ্য দুঃসমাধ্য সমস্যারই সৃষ্টি করে থাকে। তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান বা আইন পাস করার সময় তারা ভোটদাতা জনগণের নয়, নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনমতের কোনো তোয়াক্কাই তারা করে না।

ফলে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অসহায় জনগণের উপর জগদ্দল পাথর হয়েই চেপে বসে। নিরীহ জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠন ও নিষ্পেষণ করাই হয় তার একমাত্র কাজ।

এহেন গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ জনদরদের কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে, তারা জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। অথচ জনগণের ভোটে তারাই হয়

ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক। জনগণ সে ক্ষমতার এক কড়া-ক্রান্তিও অংশ পায় না। এ ব্যাপারে নেতা-নেত্রীদের মুখরোচক বুলি পরিষ্কার ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বলা যায়, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাত থেকে ভোটের প্রহসনের মাধ্যমে কেড়ে নিয়ে নেতাদেরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার তন্ত্র মাত্র। এ কথায় সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

মানুষ কি মানুষের গোলাম হবে?

গণতান্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একজন ভোটদাতা কারোর পক্ষে যখন ভোট প্রয়োগ করে, তখন তার এ ভোটদানের মাধ্যমে স্বতঃই এবং নিঃশব্দে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, "আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছেমত যে কোনো আইন পাস করার ক্ষমতা দিচ্ছি এবং ওয়াদা করছি যে, তুমি অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যে আইন পাস করবে, তা আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেব।"

কুরআনের দৃষ্টিতে আইন রচনার এরূপ নিরংকুশ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া সুস্পষ্ট শিরক। কেননা, এর ফলে মানুষ মানুষেরই গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

এভাবে যারাই মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাতে চায়, কুরআনের দৃষ্টিতে তারা মানুষের রব্ব (প্রভু) হতে চায়, যেমন করে নমরূদ ও ফিরাউন মানুষের রব্ব হতে চেয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরূদের রব্ব হওয়ার এবং হযরত মূসা (আ.) ফিরাউনের রব্ব হওয়ার দাবি অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে একমাত্র আল্লাহকে রব্বরূপে মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আহ্বানও ছিল সর্বতোভাবে তা-ই। পরিণামে নমরূদ ও ফিরাউন পর্যুদস্ত হয়েই প্রমাণ করে গেছে যে, তারা কেউই প্রকৃত সার্বভৌম নয়।

অতএব, আজকের মানুষের সামনে এ প্রশ্ন সুতীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে- তারা কি নিজেরা ভোট দিয়ে নিজেদের মতো মানুষকেই রব্ব বানাতে

এবং তাদের দাসানুদাস হয়ে জীবন যাপন করতে প্রস্তুত? না মানুষের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্দী হওয়ার গণতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে মানুষের রব্ব হওয়ার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে, এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, এক আল্লাহর বান্দা হয়ে জীবন যাপন করতে চান?

যদি তারা বাস্তবিকই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালেমার প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকেন, তাহলে প্রথমোক্ত পথ তাদের নয়। তাদের জন্য গ্রহণীয় পথ মাত্র একটিই এবং তা হচ্ছে শেষোক্ত পথ।

মানুষ আল্লাহর বান্দাহ, আল্লাহর খলীফা

বস্তুত মানুষ কখনও মানুষের গোলাম হতে পারে না; কোনো মানুষ পারে না মানুষের রব্ব হতে। মানুষ কেবল আল্লাহরই বান্দাহ হতে পারে। তাই মানুষকে রব্ব বানানোর তথাকথিত গণতন্ত্র কখনই গ্রহণযোগ্য নয়; তা সর্বতোভাবে পরিহার্য। অন্যদিকে প্রথমে মানুষকে রব্ব বানিয়ে মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পরে আল্লাহকে রব্ব বানানোর– আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার কথাও কোনো ঈমানদার ব্যক্তিই বলতে পারে না, মেনে নিতে পারে না কোনো মুসলমান।

অতএব যারা মনে করে, 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে' কিংবা যারা 'প্রথমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে তারপর ইসলামী হুকুমাত' কায়েম করার কথা বলে, তারা যেমন 'গণতন্ত্র' চেনে না, তেমনি জানে না ইসলামের তওহীদী আকীদার তাৎপর্য। তারা বিভ্রান্ত। রাসূলে করীম (স.) কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্ব সাময়িকভাবে মেনে নিলেও 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র সব দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-হিজরাত থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেতে পারতেন। সে পথ গ্রহণের কত প্রস্তাব– কত প্রলোভনই না তার সমীপে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তওহীদী আকীদায় বলীয়ান হয়ে এবং ও পথে ইসলাম কায়েম হতে পারে না এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে সে সব প্রস্তাব-প্রলোভনকে ঘৃণাভরে দু'পায়ে দলে গেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে–প্রতিটি দিন

নির্যাতন–নিষ্পেষণের পথে পা বাড়িয়েছেন, কিন্তু শিরক–এর কুসুমাস্তীর্ণ পথে পা বাড়ান নি। তিনি ভুলেও কখনও এ মত গ্রহণ করেন নি যে, 'ইসলাম মানুষের মন জয় করা ছাড়া কিছুতেই চালু করা সম্ভব নয়' বা 'মানুষের মন জয় করেই ইসলাম কায়েম করতে হয়।' কুরাইশ সরদারের দাবি ও প্রস্তাব মেনে নিলেই নবী করীম (স.) তাদের মন জয় করতে পারতেন; কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করে তাদের মন জয় না করেই সোজাসুজি ও সরাসরিভাবে জনগণের সামনে ইসলামে বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করতে থাকলেন। অতএব, আগে গণতন্ত্র তার পরে ইসলাম' কথাটি নবী করীম (স.)-এর সুন্নাত ও কর্মনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও কর্মনীতি

আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, নবী-রাসূলগণ কখনও গণতন্ত্র কায়েমের দাওয়াত দেননি। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার দাওয়াত দিয়েছেন এবং তা-ই হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামী হুকুমাত কায়েমের একমাত্র পথ ও পন্থা। এ পথ ও পন্থা চিরন্তন। সর্বকালের সর্বদেশের সকল অবস্থায় এ দাওয়াতই হচ্ছে আল্লাহর বান্দাগণের একমাত্র দাওয়াত। একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল পন্থা। কেননা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানের অধিকারীরাও এটা বোঝে যে, ইসলামের বিরুদ্ধতার দিক দিয়ে সামরিক শাসন ও গণতান্ত্রিক সরকার– এ দুয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্যই নেই। দু'টিরই মূলকথা মানবীয় সার্বভৌমত্ব। আর ইসলামের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। মানবীয় সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক রূপ যা-ই হোক কোনো দিনই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা ইসলাম কায়েমের পথ খুলে দেয়নি। কেননা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম হলে মানবীয় সার্বভৌমত্বের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, তাতে তার অপমৃত্যু ঘটবে। আর কোনো ব্যক্তি বা কোনো শক্তিই সহজে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হয় না।

তাই যারা মনে করে, সামরিক শাসনে দ্বীন ইসলাম কায়েমের আহ্বান দেয়া যায় না, গণতন্ত্র কায়েম হলে খুব সহজেই দেয়া যাবে– কোনো বাধা থাকবে না, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে। তারা এ-ও বোঝে না যে, সামরিক শাসন এক ব্যক্তির শাসন, তার বিরুদ্ধে জনমনে থাকে ব্যাপক ঘৃণা, ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি। এ সময়ই জনগণের সম্মুখে মানবীয় সার্বভৌমত্বের দোষ-ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা স্পষ্ট করে দেখানো অতি সহজ। গণতান্ত্রিক সরকার যেহেতু জনগণের ভোট ও সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পিছনে জনগণের অন্ধ সমর্থন থাকা স্বাভাবিক। তদুপরি সরকারি দল থাকে সারাদেশে ছড়িয়ে। তারা তাদের 'ম্যানিফেস্টো' অনুযায়ী কাজ করে অতি সহজেই জনগণকে বোঝাতে ও শান্ত করতে পারে, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে জনগণ সহজে রাযী না-ও হতে পারে। তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত দিলে সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। এ এক দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম। সরকার সামরিক না গণতান্ত্রিক, ইসলামী হুকুমাত কায়েমের সংগ্রামের দৃষ্টিতে তা একবারেই অবাস্তব। তাই আজকের ইস্যুই হচ্ছে মানুষ আল্লাহর গোলাম হবে না মানুষের? দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবে, না কি হবে কুফরী হুকুমাত; দেশে ইসলাম থাকবে কি থাকবে না? কেননা তথাকথিত ধর্মহীন গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলে তা ইসলাম কায়েমের পথে তেমনি দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন বর্তমানে[৪] সামরিক শাসন দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে যারা জয়ী হবে, যারা সরকার গঠন করবে, তারা আর যা-ই হোক ইসলামী সরকার গঠন করবে না, করবে সেকিউলার বা ধর্মহীন সরকার। সে ধর্মহীন সরকার পূর্ণ শক্তি দিয়ে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের পথ বন্ধ করে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। '৭২-এর সংবিধান গণতন্ত্রবাদীদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল এবং তারাই সংবিধানের ৩৮ ধারায় লিখে দিয়েছিল, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না। ফলে '৭৬ সন পর্যন্ত এদেশে কোনো ইসলামী দল গঠিত হতে পারেনি। তা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনী। কাজেই যাদের লক্ষ্য ইসলামী হুকুমাত কায়েম করা, তাদের নিকট বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি এক বিন্দু আকর্ষণ থাকতে পারে না।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই সঠিক

তাই দেশের মুমিন-মুসলিমদেরকে গণতন্ত্র নয়, ইসলামী হুকুমাত তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য অনতিবিলম্বে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এই সংগ্রামকারীদের বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, গণতন্ত্র বা কোনো তন্ত্র-মন্ত্র নয়, একমাত্র ইসলামী হুকুমাত তথা খিলাফত কায়েমই হলো মুক্তির পথ। এ ছাড়া বর্তমান সমস্যাবলির কোনো সমাধানই হতে পারে না।

খিলাফত কুরআন মজীদেরই একটি পরিভাষা। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তাঁর বান্দাহ হিসাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মানুষকে যে সব মহৎ গুণের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন, তাতে মানুষ কখনই, কোনো অবস্থায়ই আল্লাহ– (সার্বভৌম বা রব্ব) হতে পারে না, পারে না আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) হতে, খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে। তাই মানবীয় সার্বভৌমত্বভিত্তিক 'গণতন্ত্র' যেমন মানুষের জন্য একটি ধোঁকা-একটি বিরাট প্রতারণা, তেমনি তা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃতি ও মানবীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমান পোষণেরও মতবাদ। এ মতবাদের শ্লোগান দিয়ে দিয়ে এত দিন পর্যন্ত মানুষের প্রভু বা রব্ব-নিরংকুশ শাসক হতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে মারাত্মক ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে। এই ধোঁকা থেকে মুক্তিলাভ না করা ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত কোনো মু'মিন-মুসলিমই ঈমানী দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিপ্লবেরই প্রচেষ্টা। এ বিপ্লবের পরিণতিতেই সম্ভব বর্তমান প্রশাসন কাঠামোকে-যা গোলামীর প্রতীক, যা ইসলাম কায়েমের প্রধান প্রতিবন্ধক- উৎখাত করে খিলাফতে রাশেদার আদর্শ প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। শুধুমাত্র ক্ষমতার হাত-বদলই এর লক্ষ্য নয় বস্তুত খিলাফত প্রতিষ্ঠা তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই সম্ভব। গণতান্ত্রিক সরকার এ ভূখণ্ডে একাধিকবার গঠিত হয়েছে; কিন্তু গণতন্ত্র মুদ্রার অপর পিঠে যেহেতু স্বৈরতন্ত্র মুদ্রিত, তাই গণতান্ত্রিক সরকারকে মাত্র তেরো মিনিটের

মধ্যেই স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে এবং তার হাতে জনগণের যাবতীয় মৌলিক অধিকার অপহৃত হতে দেখা গেছে প্রত্যক্ষভাবে।

মুলতবী সংবিধানকে[৫] বহুদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে বড় গলায় দাবি করা হয় এবং তাকে পুনর্বহাল করে তারই ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও দাবি জানানো হচ্ছে জোরে-শোরে। সামরিক সরকার প্রধান (এরশাদ)ও সেই মুলতবী সংবিধান বহাল করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি তো দেবেনই। কেননা, জনগণের রব্ব বা খোদা হয়ে বসার জন্য মুলতুবি সংবিধান একটি মোক্ষম হাতিয়ার। তাতে প্রেসিডেন্টকে এত নিরংকুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কুরআন অনুযায়ী যা একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।[৬] ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে সে সংবিধান পাঠ করলেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তাই মুলতুবি সংবিধান হচ্ছে প্রেসিডেন্টকে– অথবা একজন সাধারণ মানুষকে রব্ব বা খোদার আসনে বসানোর সংবিধান। কোনো ঈমানদার ব্যক্তিই কি কোনো মানুষকে খোদার আসনে বসাতে রাজি হতে পারে?

তাই মুলতুবি সংবিধান বহাল করা হলে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নিজেদের হাতেই চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হবে। এ কারণেই খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে গঠিত ইসলামী দলসমূহের সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ[৭] মুলতুবি সংবিধান বহাল করার সুস্পষ্ট বিরোধী। তার পরিবর্তে ইসলামী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বে ঈমানদার বুদ্ধিজীবী ও হক্কানী আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির দ্বারা নতুন করে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সংবিধান রচনার কার্যসূচি গ্রহণ করেছে।

বস্তুত পুরাতনকে মেরামত করে, জোড়াতালি দিয়ে দুর্নীতি ও কুসংস্কারের জঞ্জালে নিমজ্জিত বর্তমান মুসলিম সমাজকে ইসলামী বানানো সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাস্তবায়ন সম্ভব একটি ইসলামী বিপ্লবের দ্বারা; সে বিপ্লবই হওয়া উচিত মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য।

এ দাওয়াত কবুল করে সম্মিলিতভাবে খিলাফত কায়েমের জিহাদে জান-মাল দিয়ে শরীক হওয়ার আহ্বান জানাই।

(১৯৮৫ সালের প্রথম ভাগে ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের এক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের লিখিত রূপ)

টীকা

১. অধুনা কিছু কিছু চতুর বুদ্ধিজীবী 'সেকিউলার' শব্দটির তর্জমা করতে চান ইহজাগতিকতা-ধর্মহীনতা নয়। অথচ চেম্বার, অক্সফোর্ড প্রভৃতি অভিধানে সেকিউলার বলতে ধর্মবর্জিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে।

২. ১৯৯১-এর নির্বাচন পরবর্তী খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব এবং ১৯৯৬-এর নির্বাচন-পরবর্তী শেখ হাসিনার নেতৃত্বকেও এ থেকে পৃথক করা চলে না। কারণ ঐ দুই নির্বাচনের পর দেশে ঐ দুই ব্যক্তিরই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. সাম্প্রতিককালে নির্বাচন এমন একটি তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে যে, এখন আর সব ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতিরও প্রয়োজন হয় না। ভোটারের উপস্থিতি ছাড়াই ব্যালট বাক্স পূর্ণ হয়ে যায়। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮-এর নির্বাচন এরই অকাট্য প্রমাণ।

৪. মনে রাখতে হবে কথাটি বলা হয়েছিল আশির দশকের প্রথম ভাগে দেশে সামরিক শাসন চলাকালে। কথাটির প্রেক্ষাপট পাল্টে গেলেও এর মূল আবেদন এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে।

৫. এ কথাটিরও প্রেক্ষাপট আশির দশকের সামরিক শাসন চলাকালীন পরিস্থিতি। ১৯৯১ সালের নির্বাচিত পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেছে মাত্র।

৬. সংবিধান সংশোধনের পর বর্তমানে এ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ভোগ করছেন।

৭. এ পরিষদ গঠিত হয়েছিল আশির দশকের গোড়ার দিকে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে। পরে হাফেজ্জী হুজুরের নিজস্ব দলটি '৮৬-এর নির্বাচনে অংশ নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদবধি ইসলামী ঐক্য আন্দোলন ঐ একই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। – সম্পাদক

বাণী চিরন্তন

এদেশের মুসলিম জনতা শুধু মানচিত্র বদলই নয়, ইংরেজ আমলের যাবতীয় অভিশাপ থেকে মুক্তি চায়।

আজকের বাস্তব অবস্থা দেখে মনে হয় এদেশটি স্বাধীন হলেও স্বাধীন নয়- নিতান্তই গোলাম দেশ, পরাধীন জীবন।

পাশ্চাত্যের এ গণতন্ত্রের সার কথা হল জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের উপর নির্বাচিত লোকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব।

মানুষ কখনও মানুষের গোলাম হতে পারে না। কোন মানুষ পারে না মানুষের রব হতে। মানুষ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা হতে পারে।

-গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব

এদেশের বিপুল সংখ্যক আলিম রূপে পরিচিত ব্যক্তি বার বার জালিম তাগুতী শাসকের হাতে বিক্রি হয়ে ঈমানী তাকীদের কথা ভুলে গেছেন, ভুলে গেছেন তাদের মহান মর্যাদার কথাও। হারিয়ে ফেলেছেন তাদের সম্মানটুকু।

-ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা

ইসলাম সম্পর্কে একথা চূড়ান্ত যে, তা সামগ্রিক জীবনের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী আদর্শ, এক বিশ্বজনীন পুনর্গঠন প্রচেষ্টা, এক সর্বাত্মক সংগ্রামের নাম, তা একটি চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন বিধান- একটি আপোষহীন সংগ্রাম।

-শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

খায়রুন প্রকাশনী